সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ৮ম আয়াত সংখ্যাঃ (৬০-৬৬)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ الۡمَسٰكِیۡنِ وَ الۡعٰمِلِیۡنَ عَلَیۡهَا وَ الۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَ فِی الرِّقَابِ ৯ : ৬০
وَ الۡغٰرِمِیۡنَ وَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ؕ فَرِیۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِیۡمٌ حَكِیۡمٌ

৬০. সদকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়ত।

এই আয়াতে স্বাদক্বাহ পাওয়ার হকদার লোকদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এখানে স্বাদক্বাসমূহ থেকে উদ্দেশ্য যাকাত। আয়াতের প্রারম্ভে إِنَّمَا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; যা সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্টীকরণের জন্য আসে। الصَّدَقَات শব্দে ال আর্টিক্যালটি শ্রেণী বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, (যাকাত) শ্রেণীর স্বাদক্বাহ এই আট ধরনের লোকদের উপর সীমাবদ্ধ বা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাদের উল্লেখ আয়াতে এসেছে। এরা ছাড়া অন্য কারো জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা শুদ্ধ নয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগনের ঐক্যমতে এ আয়াতে সেই ওয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা মুসলিমদের জন্যে সালাতের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদকারই খাত। হাদীস অনুযায়ী নফল সদকা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ব্যয় খাত ঠিক করে দিয়ে কারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হুকুম মতেই যাকাতের বিলি বন্টন করেছেন নিজের খেয়াল খুশীমত নয়। এক হাদীসে এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। যিয়াদ ইবন হারিস আস-সুদায়ী বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তার গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরেই প্রেরণ করবেন।

আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনি বিরত হোন আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। তারপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, 'তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা। আমি আরয করলাম এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলিম হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সাহায্য চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জবাব দিলেন, সদকার ভাগ বাটোয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদকার আটটি খাত

নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি। [আবু দাউদ ১৬৩০; দারাকুতনী: ২০৬৩]

ইসলামী পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সম্পদের ভেতর শরী ‘আত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণকে যাকাত বলা হয়, যা বিশেষ শ্রেণি ও নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হয়। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে যাকাত ফরয,এতে কারও দ্বিমত নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।’ -ফাতহুল বারী ৩/৩০৯

যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই

এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল।

(২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) যাকাত প্রদান করা।

(৪) কা ‘বা গৃহে হজ্জ করা।

(৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা।’ সহিহ বুখারিঃ ৮; সহিহ মুসলিমঃ ১৬

আরবী الزكاة ‘ যাকাত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি ও উন্নতি।

যাকাত শব্দের আভিধানিক আরেকটি অর্থ হয় لتطهير তাতহির, যার বাংলা অনুবাদ পবিত্র করা।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴿۱۰۳﴾

‘তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ সূরা তাওবা : ১০৩

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴿۱۱۰﴾

‘তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। সূরা বাকারা : ১১০

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴿۵۶﴾

‘তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।’ সূরা নূর : ৫৬

وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

‘এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।’ সূরা নিসাঃ ১৬২

প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের।

আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। [কুরতুবী] ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথাঃ যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোশাক পরিচ্ছদ ও আসবাব পত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে। সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সেই নেসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। [কুরতুবী]

অনুরূপ যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে সব মিলিয়ে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রুপার সমমূল্য হয় তবে সেও নেসাবের মালিক, তাকেও যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। কারণ সে ধনী ব্যক্তি। আর ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সদকা গ্রহণ জায়েয নয় ধনীর জন্য, অনুরূপভাবে শক্তিশালী উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য [আবু দাউদ ১৬৩৪; তিরমিযী: ৬৫২]

মিসকীনের ব্যাপারে এক হাদীস এসেছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, ‘মিসকীন’ সে নয় যে দু-এক লোকমার জন্য বা দু-একটি খেজুরের জন্য লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়। বরং ‘মিসকীন’ তো সেই যার কাছে এতটা পরিমাণ মাল থাকে না, যাতে তার প্রয়োজন মিটে যায়। যে না নিজের দরিদ্রতাকে প্রকাশ করে যে, লোকে তাকে গরীব ও হকদার বুঝে স্বাদক্বা-খায়রাত করবে। আর না সে নিজে থেকে কারো কাছে যাচ্ঞা করে। (বুখারী ও মুসলিম যাকাত অধ্যায়) হাদীসে আসল মিসকীন উক্ত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামী ফিকহের ইমামদের মতে, শব্দ দুটি যদি আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে একটি দিয়ে অন্যটিকেও বোঝানো হয় (অর্থাৎ অভাবী ব্যক্তি)। তবে যখন দুটি শব্দ একসাথে ব্যবহৃত হয় (যেমন যাকাতের আয়াতে), তখন তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়:ফকীর (فقير): যার জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম কোনো সম্পদ বা উপার্জনের ব্যবস্থা নেই। সে মিসকীনের চেয়েও বেশি অভাবী।মিসকীন (مسكين): যার কিছু আয়-উপার্জন বা সম্পদ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তার বা তার পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) পুরোপুরি মেটে না।

শাইখ উসাইমীন রহ. বলেন: “যে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তার নিকট মোহর ও বিবাহের খরচ নেই, আমরা তাকে যাকাত দিব, যা দিয়ে সে বিয়ে করবে, যদিও তার পরিমাণ বেশি হয়। অর্থাৎ সে ফকীর ও মিসকীনদের একজন, যাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ, যদিও তার পানাহার, পরিধান ও বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে।আশ-শারহুল মুমতি ‘: যাকাত অধ্যায়।

যাকাতের ৩য় ব্যক্তি হলেন আমেলীনে সদক অর্থাৎ সদকা সম্পৃক্ত কাজে নিযুক্ত কর্মী।

এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে বায়তুলমালের জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। [কুরতুবী] এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে। এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সদকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে, “হে রাসূল! আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা গ্রহণ করুন।” [১০৩] উক্ত আয়াত মতে রাসূলের অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল মুমেনীন বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর যাকাত ও সদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়।

বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে “আমেলীন” বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেসব সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীসে এসেছে, ধনীদের জন্য সদকার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই যদিও সে স্বদেশী ধনী। দ্বিতীয়তঃ সদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থশালী ব্যক্তি যার মজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরীব মিসকীন থেকে সদকার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমতঃ যাকে গরীব লোকেরা সদকার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে। [আবু দাউদ ১৬৩৫]

ব্যক্তিগত ভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যাকাত উসুলকারী হবে না।

যাকাত উসুলকারীদের(যাকাতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ) গুণাবলি:

ক. বিশুদ্ধ মত মোতাবেক যাকাত উসুলকারীর মুসলিম হওয়া জরুরি,

খ. সাবালক ও বিবেকী হওয়া।

গ. আমানতদার হওয়া।

ঘ. যাকাত উসুল করার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া। যেমন, সত্যবাদী ও নেককার।

ঙ. যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইলম থাকা।

“আমরা যাকে কোন কাজের দায়িত্ব দেই এবং তার প্রাপ্যও তাকে প্রদান করি, (অর্থাৎ তাকে তার বেতন দেই), তারপর সে যা গ্রহণ করবে তাই খিয়ানত” । সহিহুল জামে ‘ হাদীস নং ৬০২৩। সেটি হারাম সম্পদ।

“তোমার বাবা-মায়ের ঘরে কেন তুমি বসে থাকনি, তোমার হাদিয়া তোমার নিকট চলে আসত, যদি তুমি সত্যবাদী হও? অতঃপর তিনি বললেন: এমন কেন হয়, আমি তোমাদের কাউকে কোনও কাজে পাঠাই আর সে এসে বলে: এগুলো আপনাদের জন্য আর এগুলো আমার জন্য হাদিয়া? কেন সে তার মায়ের ঘরে বসে থাকে নি, যেন তার হাদিয়া তার কাছেই চলে আসে! সে সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার নফস, তোমাদের যে কেউ অবৈধভাবে যাই গ্রহণ করবে, আল্লাহর সমীপে তা নিয়ে উপস্থিত হবে” ।সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৯৭।

যাকাতের চতুর্থ ব্যয় খাত হল ‘মুআল্লাফাতুল কুলুব’ ।

সাধারণত তারা তিন চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলিম, কিছু অমুসলিম। মুসলিমদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ ছিল ধনী কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেই ছিল পরিপক্ক মুসলিম, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলিমদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল।

আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না, বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টা ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহর বান্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুল কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদকার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধীতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করেছে ঠিকই কিন্তু অর্থের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শত্রুতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশঙ্কা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, এ ধরনের লোকেদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা কমপক্ষে এমন শত্রুতে পরিণত করা যায়, যারা কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এ খাতে গণিমতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যাকাতের তহবিল থেকেও ব্যয় করা যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য, ফকির, মিসকিন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেয়া যেতে পারে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবী (সা.) এর আমলে তালীফে কলব, তথা মন জয় করার উদ্দেশ্যে বহু লোককে বৃত্তি দেয়া এবং এককালীন দান করা হতো। কিন্তু তার পরেও এ খাতটি অপরিবর্তিত ও অব্যাহত

রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম আবু হানিফা (র) ও তার সহযোগীদের মতে, হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমরের(রা.) আমল থেকে এ খাতটি রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন তালীফে কলবের জন্য কাউকে কিছু দেয়া জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে তালীফে কলবের উদ্দেশ্যে ফাসেক মুসলমানদেরকে যাকাত তহবিল থেকে দেয়া যেতে পারে কিন্তু কাফেরদের দেয়া যেতে পারে না। অন্যান্য কতিপয় ফকীহের মতে, মুআল্লাফাতুল কুলুব, (যাদের মন জয় করা ইপ্সিত হয়) এর খাত আজও অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে এ খাতে ব্যয় করা যেতে পারে।

হানাফীগণ এ প্রসঙ্গে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর উয়াইনা ইবনে হিসন ও আকরা ইবনে হাবেস হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে আসে এবং তাঁর কাছে একটি জমি চায়। তিনি তাদেরকে জমিটির একটি দানপত্র লিখে দেন। তারা এ দানপত্রকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য অন্যান্য প্রধান সাহাবীগণের সাক্ষ্যও এতে সন্নিবেশ করতে চায়। সেমতে অনেক সাক্ষ্য সংগৃহীত হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন হযরত উমরের (রা.) কাছে সাক্ষ্য নিতে যায় তখন তিনি দানপত্রটি পড়ে তাদের সামনেই সেটি ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, অবশ্যই তালীফে কলব করার জন্য নবী (সা.) তোমাদের দান করতেন। কিন্তু তখন ছিল ইসলামের দুর্বলতার যুগ। আর এখন আল্লাহ ইসলামকে তোমাদের মতো, লোকদের প্রতি নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ ঘটনার পর তারা হযরত আবু বকরের (রা.) এর কাছে এসে অভিযোগ করে এবং তাকে টিটকারী দিয়ে বলেঃ খলীফা কি আপনি, না উমর? কিন্তু হযরত আবু বকর নিজেও এর কোন প্রতিবাদ করেননি। কিংবা অন্যান্য সাহাবীদের একজনও হযরত উমরের এ মতের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এ থেকে হানাফিগণ এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তারা অর্জন করেছে তখন যে কারণে প্রথম দিকে মুআল্লাফাতুল কুলূবের অংশ রাখা হয় তা আর বর্তমান রইলো না। এ কারণে সাহাবীগণের ইজমার মাধ্যমে এ অংশটি চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে গেছে।

ইমাম শাফিয়ী (র) এ প্রসঙ্গে প্রমাণ পেশ করে বলেন, তালীফে কলব, এর জন্য যাকাতের মাল দেবার ব্যাপারটা নবী (সা.) এর কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণিত নয়। হাদীসে আমরা যতগুলো ঘটনা পাই তা থেকে একথাই জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তালীফে কলবের জন্য কাফেরদেরকে যা কিছু দেবার তা গণিমতের মাল থেকেই দিয়েছেন, যাকাতের মাল থেকে দেননি।

আমাদের মতে প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মুআল্লাফাতুল কুলুবের অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল হবার কোন প্রমাণ নেই। হযরত উমর (রা.) যা কিছু বলেছেন তা নিঃসন্দেহে পুরোপুরি সঠিক ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র যদি তালীফে কলবের জন্য অর্থ-ব্যয় করার প্রয়োজন নেই মনে করে, তাহলেও এ খাতে কিছু ব্যয় করতেই হবে এমন কোন ফরয তার ওপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। কিন্তু কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে যাতে ব্যয় করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ যে অবকাশ রেখেছেন তা অবশ্যই অক্ষুণ্ন থাকা উচিত। হযরত উমর ও সাহাবায়ে কেরামের যে বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল তা ছিল মূলত এই যে, তাদের আমলে যে অবস্থা ছিল তাতে তালীফে কলবের জন্য কাউকে কিছু দেবার প্রয়োজন তারা অনুভব করতেন না। কাজেই কোন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী স্বার্থ তথা প্রয়োজন ও কল্যাণের খাতিরে কুরআনে যে খাতটি রাখা হয়েছিল, সাহাবীগণের মতৈক্য তাকে খতম করে দিয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতটি অবশ্যই এতটুকু পর্যন্ত তো সঠিক মনে হয় যে, সরকারের কাছে যখন অন্যান্য খাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ মওজুদ থাকে তখন তালীফে কলবের খাতে তার যাকাতের অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করা উচিত। কিন্তু যখন যাকাতের অর্থ-সম্পদ থেকে এ খাতে সাহায্য নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তা ফাসেকদের জন্য ব্যয় করা যাবে, কাফেরদের জন্য ব্যয় করা যাবে না, এ ধরনের পার্থক্য কারার কোন কারণই সেখানে নেই। কারণ কুরআনে মুআল্লাফাতুল কূলুবের যে অংশ রাখা হয়েছে, তা তাদের ঈমানের দাবীর কারণে নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম নিজের প্রয়োজনে তাদের তালীফে কলব তথা মন জয় করতে চায়। আর শুধুমাত্র অর্থের সাহায্যেই এ ধরনের লোকদের মন জয় করা যেতে পারে। এ প্রয়োজন ও এ গুণ-বৈশিষ্ট্য যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই মুসলমানদের সরকার কুরআনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার অধিকার রাখে। নবী (সা.) এ খাত থেকে কাফেরদের কিছুই দেননি। এর কারণ তার কাছে অন্য খাতে অর্থ ছিল। নয়তো এ খাত থেকে কাফেরদেরকে দেয়া যদি অবৈধ হতো তাহলে তিনি একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতেন।

যাকাতের ৫ম খাতঃ দাসদেরকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করা

এই কাজের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা দু' ভাবে হতে পারে। এক, যে দাস তার মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, সে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ আদায় করলে মালিক তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেবে। তাকে দাসত্ব মুক্তির এ মূল্য আদায় করতে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়। দুই, যাকাতের অর্থে দাস কিনে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিকে হযরত আলী(রা.) সাঈদ ইবনে জুবাইর, লাইস, সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ নাজায়েজ গণ্য করেন অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী, মালেক, আহমদ ও আবু সাওর একে জায়েয মনে করেন।

যাকাতের ৬ষ্ট ব্যয় খাত হল দেনাদার বা ঋণগ্রস্ত।

আয়াতে বর্ণিত "গারেমীন" হলো "গারেম" এর বহুবচন এর অর্থ দেনাদার, [জালালাইন]। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই "গারেম" বলা হয়, যে আল্লাহর আনুগত্যে তার নিজ ও পরিবারের ব্যয় মেটানোর জন্য খরচ করতে গিয়ে এমন ঋণী হয়ে গেছে যে, সেটা শোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। [আইসারুত তাফসীর] আবার কোন কোন ইমাম এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। [কুরতুবী] কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে-যেমন, মদ কিংবা নাজায়েয প্রথা অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না, যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

এখানে জানা আবশ্যক যে, ঋণগ্রস্থতা কয়েক কারণে হতে পারে।

এক. মানুষের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্য, মীমাংসার জন্য কেউ কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে। যেমন, দু' দল লোকের মধ্যে সমস্যা লেগে গেছে, একজন লোক পয়সা খরচ করে দু'দলের সমস্যাটা

সমাধান করে দেয়। এ ধরনের লোকের জন্য শরী’ আতে যাকাতের টাকায় হিস্যা রেখেছে, যাতে করে মানুষ এ ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়।

দুই. যে ঋণগ্রস্থ হয় নিজের জন্য, তারপর ফকীর হয়ে যায়, তাকে তার ঋণগ্রস্থতা থেকে মুক্তির জন্য যাকাত থেকে দেয়া যেতে পারে। [বাগভী; সাদী] প্রথম প্রকারের উদাহরণ যেমন হাদীসে এসেছে, কাবীসা ইবন মুখারিক আল-হিলালী বলেন, আমি একবার পরস্পর সম্পর্ক ঠিক রাখতে গিয়ে মাথার উপর ঋণের বিরাট বোঝা বহন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আসি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমাদের কাছে অবস্থান কর, যাতে করে সদকা তথা যাকাতের মাল আসলে তোমাকে দিতে পারি। তারপর তিনি বললেন, হে কাবীসা! তিন জনের জন্যই কেবল চাওয়া জায়েয।

এক. যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঋণের বোঝা বহন করেছে, তার জন্য চাওয়া জায়েয, যতক্ষণ না সে তা পাবে। তারপর তাকে চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

দুই. আর একজন যার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তারজন্যও কোন প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করা পর্যন্ত চাওয়া জায়েয।

তিন. আর একজন লোক যাকে দারিদ্রতা পেয়ে বসেছে। তখন তার কাওমের তিনজন গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, আল্লাহর শপথ! অমুক হত-দরিদ্র হয়ে পড়েছে। সে ব্যক্তিও জীবিকার ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত যাচঞা করতে পারে। এর বাইরে যত চাওয়া আছে সবই হারাম। [মুসলিম: ১০৪৪]

যাকাতের ৭ম খাত আল্লাহর রাস্তায় হকদারঃ ফী সাবীল্লিাহ বা আল্লাহর রাস্তার যাত্রীগণ:

আল্লাহর রাস্তা দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ। অতএব, মুজাহিদ ও মুজাহিদদের অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য যাকাত খরচ করবে, যদিও তারা ধনী হয়। অতএব, গোলাবারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র খরিদ করা, যুদ্ধের বিমান ঘাটি তৈরি করা, শত্রুদের সন্ধান দাতার বেতন ইত্যাদি এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

‘ফি সাবিলিল্লাহ’ যেহেতু বিশুদ্ধ মতে কেবল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকেই বুঝায়, সেহেতু মসজিদ তৈরি, রাস্তা সংস্কার ও কিতাব ছাপানোর জন্য যাকাত খরচ করা বৈধ নয়।

আলেমগণ বলেন: আল্লাহ্‌র রাস্তার মধ্যে শামিল সেই ব্যক্তিও যিনি নিজেকে অন্য কিছু বাদ দিয়ে ইলমে শরয়ি অর্জনে নিমগ্ন রাখেন। তাই এমন ব্যক্তিকে তার খরচ, পোশাক, খাবার, পানীয়, বাসস্থান ও বইপুস্তক যা প্রয়োজন এগুলোর জন্য যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে। কেননা ইলমে শরয়ি এক প্রকার আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ। বরং ইমাম আহমাদ বলেন: “ইলমের তুল্য কিছু নাই; যদি নিয়ত শুদ্ধ হয়।” কারণ ইলম হচ্ছে শরিয়তের সবকিছুর মূল। ইলম ছাড়া কোন শরিয়ত নেই। আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন যাতে করে মানুষ ন্যায় বাস্তবায়ন করে, তাদের শরিয়তের বিধিবিধান শেখে এবং আবশ্যকীয় বিশ্বাস, কথা ও আমল জানে। হ্যাঁ; আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ সেটা সর্বোত্তম আমল। বরং ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। জিহাদের মর্যাদার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামে ইলমের মর্যাদাও অনেক বড়। তাই ইলম আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এটি সুস্পষ্ট; যাতে কোন আপত্তি নেই

আল্লাহর পথে শব্দ দু' টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সৎকাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এমন সমস্ত কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন যে, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে যাকাতের অর্থ যে কোন সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম যুগের ইমামগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মত পোষণ করেছে সেটিই যথার্থ সত্য। তাদের মতে এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থা সম্পন্ন হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্য নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

যাকাতের ৮ম হকদার: মুসাফির

ইবনুস সাবিল বা মুসাফির: ইবনুস সাবিল অর্থ মুসাফির, অর্থাৎ যার চলার খরচ নেই। প্রয়োজনীয় খরচ হারিয়ে গেছে অথবা ফুরিয়ে গেছে অথবা কোনও বিপদের কারণে তার অর্থ প্রয়োজন। এরূপ ব্যক্তিকে সফর পূর্ণ করে দেশে ফিরার জন্য যাকাত দেওয়া বৈধ, যদিও সে নিজ দেশে ধনী।

নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

১. যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য মুসাফিরের সফর শর 'ঈ অথবা বৈধ হওয়া জরুরি, যদি পাপের সফর হয়, যাকাতের হকদার হবে না, যদি তাওবা করে অবশিষ্ট সফরের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ। কারণ, তাওবা ঘোষণার পর থেকে তার সফর বৈধ।

২. বিশুদ্ধ মতে ইবন সাবিল বা মুসাফিরকে যদি ঋণ দেওয়ার মতো লোক থাকে, তবুও তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, তার জন্যও যাকাত নেওয়া বৈধ, যদি আগেই ঋণ নিয়ে নেয়, যাকাত নিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে।

জরুরি জ্ঞাতব্য:

যেসব মুসলিম অত্যাচারী শাসকের ভয় বা কোনও কারণে নিজ দেশ থেকে অপর দেশে শরণার্থী হয়, তাদেরকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা জরুরি, যদি তাদের প্রয়োজন হয়। তারা ফকীর-মিসকিন বা ইবন সাবিল বা ঋণগ্রস্ত ইত্যাদি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবন তাইমিয়াহ রহ. বলেন: "যাকাত দাতার উচিৎ যাকাতের জন্য শরী 'আতের পাবন্দ ফকীর, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত ও অন্যান্য হকদার অন্বেষণ করা, বিদ 'আতী ও পাপে লিপ্তদের যাকাত না দেওয়া। কারণ, তারা শাস্তির উপযুক্ত, তাদেরকে সাহায্য করা বৈধ নয়, বরং যাকাত না দিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিৎ" ।মাজমুউ ফাতাওয়া: ২৫/৮৭।

তিনি আরও বলেন: “যে সালাত পড়ে না তাকে যাকাত দিবে না, যতক্ষণ না সে তাওবা করে সালাত পড়া আরম্ভ করে” ।আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়্যাহ: (পৃ.৬১

শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাতের মাল ভক্ষণ করা বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয় এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্যও হালাল নয়’ । তিরমিযী হা/৬৫২; নাসাঈ হা/২৫৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/১৮৩০; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে ‘ হা/৭২৫১।

আটটি খাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। তিনি জানেন বান্দাদের স্বার্থ কোথায় আছে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

লক্ষণীয় যে, এ আটটি খাতকে আমরা দু’ ভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. এমন কিছু খাত আছে যেগুলোতে ঐ লোকদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে ও উপকারার্থে দেয়া হচ্ছে, যেমন, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি।

দুই. এমন কিছু খাত আছে যেগুলোতে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজনে, ইসলামের উপকারার্থে, কোন ব্যক্তির প্রয়োজনার্থে নয়। যেমন, মুআল্লাফাতি কুলুবুহুম, আমেলীন ইত্যাদি।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা যাকাত দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের সাধারণ ও বিশেষ যাবতীয় প্রয়োজনীয় পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। যদি ধনীগণ শরীআত মোতাবেক তাদের যাকাত প্রদান করত, তবে অবশ্যই কোন মুসলিম ফকীর থাকত না। তাছাড়া এমন সম্পদও মুসলিমদের হস্তগত হতো যা দিয়ে তারা মুসলিম দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে সমর্থ হতো। আর যার মাধ্যমে তারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে পারত এবং যাবতীয় দ্বীনী স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হতো। [সা’ দী]

وَ مِنۡهُمُ الَّذِیۡنَ یُؤۡذُوۡنَ النَّبِیَّ وَ یَقُوۡلُوۡنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلۡ اُذُنُ خَیۡرٍ لَّکُمۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ ৯ : ৬১
یُؤۡمِنُ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ رَحۡمَةٌ لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ ؕ وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡذُوۡنَ رَسُوۡلَ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

৬১. আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, সে তো কর্ণপাতকারী। বলুন, তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শুনে। তিনি আল্লাহর উপর ঈমান আনেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করে; আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তিনি তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

ইবনে আব্বাস বলেন, নবতাল ইবনুল হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বসত। তারপর সেখানে যা শুনত তা মুনাফিকদের কাছে পাচার করত। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ সে তাদের কাছে

গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে বলেছিল যে, তিনি কান কথা বেশী শুনেন। তিনি সবার কথা শুনেন। [তাবারী] অথবা তারা বলতে চেয়েছিল যে, আমরা যা বলছি তা যদি মুহাম্মাদের কানে যায়, তারপরও কোন অসুবিধা নেই, কারণ তার কাছে গিয়ে ওজর পেশ করব। আর তিনি সব কথাই শুনে থাকেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। এভাবে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন খারাপ মন্তব্য করতে লাগল যে, তিনি সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম নন। অথচ তিনি তাদের হিদায়াতের জন্যই প্রেরিত। এটা নিঃসন্দেহে রাসূলকে কষ্ট দেয়া। [সা' দী]

আল্লাহ্ তা'আলা তার জবাবে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল কথা শুনেন। তার কথাগুলো ঈমানদারদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহর উপর ঈমান রাখেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করেন। [তাবারী] শানকীতী বলেন, আয়াতে সে সমস্ত লোকদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত ও তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সেখানে এসেছে, "নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। [সূরা আল-আহযাব: ৫৭]

يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوۡكُمۡ ۚ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗۤ اَحَقُّ اَنۡ يُّرۡضُوۡهُ اِنۡ كَانُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ ৯ : ৬২

৬২. তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ করে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এর বেশী হকদার যে, তারা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা মুমিন হয়।

কাতাদা বলেন, মুনাফিকদের এক লোক বলেছিল যে, যদি মুহাম্মদ যা বলে তা সত্য হয় তবে তারা গাধার চেয়েও অধম। একথা শুনে মুসলিমদের এক ব্যক্তি বলল যে, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ যা বলে তা সত্য, আর তুমি গাধার চেয়েও অধম। মুসলিম লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি জানাল। তিনি মুনাফিকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ কথাটি তুমি কেন বলেছ? সে লা'নত দিতে লাগল এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, সে তা বলেনি। তখন মুসলিম লোকটি বলল, হে আল্লাহ্! আপনি সত্যবাদীকে সত্যায়ন করুন আর মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবন কাসীর]

অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে সন্তুষ্ট করতে চায়। অথচ তাদের উচিত ঈমান এনে আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করবে। [মুয়াসসার] কারণ একজন মুমিনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা। মুমিন এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয় না। তারা যেহেতু সেটা করছে না সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, তারা ঈমানদার নয়। [সা'দী]

৯ : ৬৩ اَلَمۡ یَعۡلَمُوۡۤا اَنَّهٗ مَنۡ یُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِیۡهَا ؕ ذٰلِکَ الۡخِزۡیُ الۡعَظِیۡمُ

৬৩. তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য তো আছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে স্থায়ী হবে? এটাই চরম লাঞ্ছনা।

তারা যেহেতু রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, মুমিনদের কাছে মিথ্যা শপথ করে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে, সুতরাং তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতায় নেমেছে। আর যারাই আল্লাহ্ তা'আলা ও তার রাসূলের বিরোধিতায় নামে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আর তা নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিত জীবন। [সা'দী; মুয়াসসার]

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর। আনফালঃ১৩

নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আর আমরা সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি–আল-মুজাদালাঃ ৫

আপনি পাবেননা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে–হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্ৰ, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। আল-মুজাদালাঃ ২২

আর কারো নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস! সূরা আন-নিসাঃ ১১৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেনঃ যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে। সহিহ বুখারী(আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৮৩)

৯ : ৬৪ یَحۡذَرُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ اَنۡ تُنَزَّلَ عَلَیۡهِمۡ سُوۡرَۃٌ تُنَبِّئُهُمۡ بِمَا فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ ؕ قُلِ اسۡتَهۡزِءُوۡا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخۡرِجٌ مَّا تَحۡذَرُوۡنَ

৬৪. মুনাফেকরা ভয় করে, তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না নাযিল হয়, যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে! বলুন, 'তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর নিশ্চয় আল্লাহ তা বের করে দেবেন।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে জানাচ্ছেন যে, মুনাফিকরা এ ভয়ে থাকে যে, কখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সূরা নাযিল হয়ে তাদের অপমানিত করবে, তাদের মনের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করে দিবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিলেন যে, তারা যতই গোপন করুক না কেন আল্লাহ তা অবশ্যই বের করে দেবেন। [আদওয়াউল বায়ান] মুজাহিদ বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলে তারপর ভাবতে থাকে যে, এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ আমাদের এ গোপন কথা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন? কাতাদা বলেন, তাদের মনের গোপন কথাগুলো বলে দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করলেন। আর এ জন্যই এ সূরার অপর নাম আল-ফাদিহা বা অপদস্থকারী বা অপমানকারী। [ইবন কাসীর]

অন্য আয়াতেও তাদের এ আশঙ্কার কথা আল্লাহ জানিয়েছেন। যেমন, "যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ কখনো তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না, আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভংগিতে জানেন।" [সূরা মুহাম্মদঃ ২৯-৩০] অন্য আয়াতে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবের কথা অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। [সূরা আল-মুনাফিকুন: ৪]

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ؕ قُلْ اَ بِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ৯ : ৬৫

৬৫. আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?

যায়দ ইবন আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক মুনাফিক আওফ ইবন মালিককে তাবুকের যুদ্ধে বলে বসল: আমাদের এ কারীসাহেবগণ (রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামদেরকে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে উপহাস করে দেয়া নাম) উদরপূর্তির প্রতি বেশী আগ্রহী, কথাবাতায় মিথ্যাচার, আর শত্রুর সামনে সবচেয়ে ভীরু। তখন আওফ ইবন মালিক বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি মুনাফিক, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানাব। আওফ তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাতে গেলে দেখতে পেলেন কুরআন তার আগেই সেটা জানিয়েছে।

যায়দ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর বলেন, তখন আমি ঐ মুনাফিক লোকটিকে দেখতে পেলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর পেছনের দিকে ঝুলে ছিল, পাথর তার উপর ছিটে এসে পড়ছিল, সে বলছিল, আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছিলেন, তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছিলে? [তাবারী]

তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা প্রায়ই তাদের আসরগুলোয় বসে নবী (সা.) ও মুসলমানদের নিয়ে হাসি-তামাসা ও বিদ্রূপ করতো। এভাবে তারা যাদেরকে সদুদ্দেশ্যে জিহাদ করতে প্রস্তুত দেখাতো নিজেদের বিদ্রূপ পরিহাসের মাধ্যমে তাদেরকে হিম্মাতহারা করার চেষ্টা করতো। হাদীসে এ ধরনের লোকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন এক মাহফিলে কয়েক জন মুনাফিক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের একজন বললো, আরে এ রোমানদেরকেও কি তোমরা আরবদের মতো মনে করেছো? কালকে দেখে নিও এ যেসব বীর বাহাদুর লড়তে এসেছেন এদের সবাইকে রশি দিয়ে বেধে রাখা হবে। দ্বিতীয় জন বললো, মজা হবে তখন যখন একশটি করে চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হবে। আরেক মুনাফিক নবী (সা.) কে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিপুলভাবে কর্মতৎপর দেখে নিজের ইয়ার বন্ধুদের বললোঃ উনাকে দেখো উনি রোমও সিরিয়ার দুর্গ জয় করতে চলেছেন।

لَا تَعۡتَذِرُوۡا قَدۡ كَفَرۡتُمۡ بَعۡدَ اِيۡمَانِكُمۡ ؕ اِنۡ نَّعۡفُ عَنۡ طَآئِفَةٍ مِّنۡكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمۡ كَانُوۡا مُجۡرِمِيۡنَ ৯ : ৬৬

৬৬. তোমরা ওজর পেশ করোনা তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব—কারণ তারা অপরাধী।

অর্থাৎ বুদ্ধি সম্পন্ন ভাঁড়দেরকে তো তবুও মাফ করে দেয়া যেতে পারে। কারণ তারা হয়েতো এ ধরনের কথা শুধু এ জন্য বলে যাচ্ছে যে, তাদের কাছে দুনিয়ার কোন জিনিসেরই কোন গুরুত্ব নেই। সব কিছুতেই তারা হালকা নজরে দেখে। কিন্তু যারা জেনে-বুঝে নিজেদের ঈমানের দাবী সত্বেও শুধুমাত্র রসূলকে এবং তিনি যে দ্বীন এনেছেন তাকে হাস্য সম্পদ মনে করার কারণেই একথা বলে থাকে এবং যাদের বিদ্রূপের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদারদের হিম্মাত ও সাহস যেন নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তারা যেন পূর্ণ শক্তিতে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে না পারে। এরূপ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত যারা তাদেরকে তো কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যেতে পারে না। কারণ তারা ভাঁড় নয়, তারা অপরাধী।

ইকরিমা বলেন, মুনাফিকদের একজনকে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক ক্ষমা করলে সে বলল, হে আল্লাহ! আমি একটি আয়াত শুনতে পাই যাতে আমাকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যা আমার চামড়া শিহরিত করে এবং অন্তরে আঘাত করে। হে আল্লাহ! সুতরাং আমার মৃত্যু যেন আপনার রাহে শাহাদাতের মাধ্যমে হয়। কেউ যেন বলতে না পারে যে, আমি অমুককে গোসল দিয়েছি, তাকে কাফন দিয়েছি, তাকে দাফন করেছি। ইকরিমা বলেন, সে ইয়ামামাহ এর যুদ্ধে মারা গেল, কিন্তু অন্যান্য মুসলিমদের লাশ পাওয়া গেলেও তাকে পাওয়া যায় নি। [ইবন কাসীর]